সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল একজন রুশীয় নাট্যপ্রেমী হেরাসিম লেবেডেফের প্রচেষ্টায়। তিনি কলকাতার পুরনো চিনেবাজারের কাছে ডোমতলা মেনে 'বেঙ্গলি থিয়েটার' স্থাপন করেন। 'Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' নামে দুটি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন তিনি। 'Disguise'-এর নামকরণ করেন 'কাল্পনিক সংবদল'— নাটকটি ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল বেঙ্গলি থিয়েটারে। অপর নাটকটির অনূদিত নাম, অভিনীত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত থেকে অনূদিত নাটক 'কুলীনকুল সর্বস্ব' প্রকাশিত হয়। নাটকটি বহুবার অভিনীত হয় এবং অভিনয় সাফল্য লাভ করে। রামনারায়ণের প্রায় সব নাটকই অনূদিত নাটক। অর্থাৎ এ পর্যন্ত যে সমস্ত বাংলা নাটক লিখিত, অভিনীত হয়েছে, তার সবই প্রায় কোনো না কোনো ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করা নাট্যরূপ। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত শর্মিষ্ঠা দেবযানী যযাতি কথাংশ অবলম্বনে রচিত মৌলিক নাটক। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) প্রথম ট্র্যাজেডি নাটকরূপে গণ্য হয় আজও। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৮২) বাংলা নাটককে অন্যমাত্রা দিয়েছিল।

অভিনেতাদের গুরু, নট-নাট্যকার, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব, বাংলা নাটক ও মঞ্চকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাঁর নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য যেমন অভিনব, তেমনি নাটকের সংখ্যাও অগণ্য। তাঁর 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪), 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'জনা' (১৯৯৪), 'বলিদান' (১৯০৫) ইত্যাদি নাটকের মঞ্চ সাফল্য অবিস্মরণীয়। একই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি— 'নুরজাহান' (১৯০৮), 'মেবারপতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯) বাংলা নাটক ও মঞ্চকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ধারা ক্রম-অগ্রসরমান। সে মৌলিক নাটক লেখা হোক বা অনুদিত নাটক উভয়ক্ষেত্রেই সমান-সত্য। রবীন্দ্রনাথের সময়েই বাংলা নাট্যজগতে আবির্ভূত হলেন বুদ্ধদেব বসু এবং আরো অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের পূর্বসূরিদের একজন এবং একইসঙ্গে তিনি বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িকও।

বুদ্ধদেব বসু একজন প্রাপ্তমনস্ক সাহিত্যিক। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সেই প্রাপ্ত মননশীলতারই ফসল। তাঁর মধ্যে নাটক অন্যতম। প্রথম জীবনে লেখা 'রাবণ' আর পরবর্তী জীবনে লেখা। একাঙ্ক গদ্যনাটক ও কাব্যনাটকগুলির আবেদন চিরকালীন শুধু প্রকাশ সৌন্দর্য-মাধুর্যে নয়, অন্য এক জীবন অনুভবের রচনায়। "আমি চাইনা উদ্ভিদের মত জীবন।/আমার সার্থকতা চেষ্টায়-সংগ্রামে।" (প্রথম পার্থ, পৃ. ১৪১) এই উক্তি শুধুমাত্র প্রথম পার্থের নয়, তার রচয়িতার নিজের জীবনেরও একটি পরম সত্য। বুদ্ধদেব বসু একজন সচেষ্ট, নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ অনুভাবী সাহিত্যিক। কোনোরকম ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেননি। "বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা, যা নিষ্ফল।/...কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে/আমি শত্রু বলে ভাবি না—/আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।" (প্রথম পার্থ, পৃ. ১২৯)

বুদ্ধদেব বসুর আবাল্য আবেগ ও উৎসাহ নাটকের প্রতি। যদিও জীবনের শেষ দশকে এসে স্বীকৃত হলেন নাট্যকার রূপে। তাঁর বিভিন্ন সময়ের মঞ্চসফল নাটকগুলির পাশাপাশি অগ্রস্থিত নাটকগুলিকেও নিবিড় আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি, যা এই মহান সাহিত্যিকের অতুলনীয় দান, বর্তমান ও ভাবী বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য পাঠককে সমৃদ্ধ করবে।

তাঁর নাটকগুলির আলোচনা করার আগে, বুদ্ধদেব বসুর নাটক রচনার মনোভূমিকে বুঝে নেওয়াটা জরুরী বলে মনে হয়েছে। তার কারণও স্বয়ং বুদ্ধদেব। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, নাটকগুলি মূলত দর্শক মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখেই লেখা হয়েছে। একটা সময় তিনিও মেনে নিয়েছিলেন— 'শ্যামবাজারিক সব বিধিবিধান'। তবু এই বিচক্ষণ, মননশীল সাহিত্যিকের মধ্যে নাটককে পাঠ্যতা গুণ সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই ছিল। স্ব-ধর্মে স্থিত বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলির অভিনবত্ব হয়তো এখানেও যে, সেগুলি অভিনেয় হওয়ার পাশাপাশি দর্শক-পাঠককে পাঠেও মনোযোগী করে তোলে অনিন্দ্যসুন্দর সংলাপে।

প্রথম অধ্যায়—বুদ্ধদেব ও সমসাময়িক বাংলা নাটক। বুদ্ধদেব বসু যে সময় (বাংলা) নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন, সেই সময়ে যাঁরা বাংলা নাটক লিখছিলেন; তাঁদের নাটক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, যাঁর কথা প্রথমেই বলতে হয়, তিনি হলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,

লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি'।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জন' নাটকের 'উৎসর্গ' অংশে এই কথাগুলো লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যেও যে রবীন্দ্র কবিমনের প্রভাব পড়বে তা বলা বাহুল্য। তাই রবীন্দ্র-নাটকের বিচার সাধারণ নাটকের আদর্শে করা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের সময়ে তাঁর রচিত কয়েকটি নাটকের মধ্যে 'তপতী' (১৯২৯), 'পরিত্রাণ' (১৯২৯, 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর পরিবর্তিত নাট্যরূপ), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসের দেশ' (১৯৩৯), 'বাঁশরি' (১৯৩৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁরা বুদ্ধদেবের সমসময়ে নাটক লিখছিলেন তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। যোগেশ চৌধুরীর (১৮৮৯-১৯৪৮) প্রথম নাটক 'সীতা' (১৯২৪)। পৌরাণিক 'সীতা' নাটক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসামান্য অভিনয় গুণে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।

পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করেও যে অতি আধুনিক যুগের মনোভাব সার্থক রূপে ফুটিয়ে তোলা যায়, এযুগের নাট্যকার মন্মথ রায়ের (১৮৯৯-১৯৮৮) নাটকগুলিই তার প্রমাণ। তাঁর নাটকে যে বিষয়-বক্তব্য প্রকাশ পেল, তার ভাব ও ভঙ্গী দুই-ই এ-কালের। কোনোমতেই সেগুলিকে পুরাকালের বলা যায় না। তাঁর আর একটি কৃতিত্ব তিনি 'একাঙ্ক' নাটকের স্রষ্টা। তাঁর প্রথম নাটক একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩)। এছাড়াও তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটকও লিখেছেন। মন্মথ রায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল— 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৯), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'কারাগার' (১৯৩০), 'সাবিত্রী' (১৯৩১), 'খনা' (১৯৩২), 'অশোক' (১৯৩৩), 'চাষির প্রেম', 'সাঁওতাল' (১৯৫৮), 'তারাস শেভচেঙ্কা' (১৯৬৫), 'দ্বিচারিণী' (১৯৭০), 'লালন ফকির' (১৯৭০) প্রভৃতি।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ (১৮৯২-১৯৬১) হয়ে ওঠার আগে তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক। তাঁর সাংবাদিক মনের প্রকাশ নাটক লেখার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর দীর্ঘ নাট্যকার জীবনে গার্হস্থ্য এবং সমাজ সমস্যামূলক নাটকের সংখ্যাই বেশি। ঐতিহাসিক নাটকও তিনি লিখেছেন। তাঁর নাটকের একটি প্রিয় বিষয়— 'নারী'। তার প্রকাশ 'জননী' (১৯৩৩), 'সবার উপরে মানুষ সত্য' (১৯৫৭), 'আর্তনাদ ও জয়নাদ' নাটকে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় নাটক 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০) এবং 'সিরাজদৌল্লা' (১৯৩৮)।

জীবনবাদী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৬৮)। তাঁর প্রথম নাটক 'মেঘমুক্তি' (১৯৩৮, 'দেহযমুনা'র পরিবর্তিত নাট্যরূপ) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের ঠিক আগের বছরে। সমাজ সমস্যা ও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হয়ে উঠেছিল মূলত তাঁর নাটকের অবলম্বন। তাঁর লেখা কয়েকটি বিখ্যাত নাটক হল— 'রক্তের ডাক' (১৯৪১), 'কা তব কান্তা' (১৯৫৩), 'পিতাপুত্র' (১৯৫৪), 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' (১৯৫৫), 'ক্ষুধা' (১৯৫৭), 'গুরুভার' (১৯৬৩), 'অন্ধদেবতা' (১৯৬৪), 'সুরা নারী সিংহাসন' (১৯৬৬), 'এন্টনি কবিয়াল' (১৯৬৭) প্রভৃতি। উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, সহায় সম্বলহীন আশাহত মানুষের জীবন কথা উঠে এলো তুলসী লাহিড়ীর (১৮৯৬-১৯৫৯) 'মায়ের দাবী' (১৯৪১, প্রথম নাটক), 'দুঃখীর ইনাম' (১৯৪৭), 'ছেঁড়াতার' (১৯৫০), 'বাংলার মাটি' (১৯৫৪) প্রভৃতি নাটকে। সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৭-১৯৭৮) 'নবান্ন' (১৯৪৪) বাংলা নাট্যসাহিত্যে নবযুগের, নব-নাট্যআন্দোলনের সূচনা করেছিল। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষের কথা উঠে এসেছে 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'পূর্ণগ্রাস' (১৯৪৮), 'গোলটেবিল' (১৯৫৪), 'মশাল' (১৯৫৪), 'সীমান্তের ডাক' (১৯৬৩), 'মা' (১৯৬৮), 'দুরন্ত পদ্মা' (১৯৭১) প্রভৃতি নাটকগুলোতে।

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)। জীবিকা তাঁর ডাক্তারি। বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল ও নিরাসক্তি-দুই-ই তাঁর সাহিত্যেও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচিত নাটকগুলিও এর প্রভাবমুক্ত নয়। 'দশভাগ' (১৯৪৪)— দশটি একাঙ্ক নাটকের সংকলন। তাঁর অনবদ্য দুই নাট্যকীর্তি জীবনী নাটক 'শ্রী মধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪৫)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর কয়েকটি উপন্যাস 'কালিন্দী' (১৯৪১), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৬), 'কবি' (১৯৫৭), 'রাধা' (১৯৬৬) প্রভৃতির নাট্যরূপান্তর করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এবং তারাশঙ্করের জীবনের একটি মিল দুজনেই সাহিত্য জীবনের শুরুতেই একজন নাট্যকার হতে চেয়েছিলেন।

উৎপল দত্ত (১৯২৯-৯৩) একজন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং আধুনিক বাংলা নাটকের সফল নাট্যকার। 'ছায়ানট' (১৯৫৮) তাঁর প্রথম নাটক। এর বিষয় চিত্রতারকাদের বহু বিচিত্র জীবনের নানা দিক। দেশ, দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনীতির নানা বিষয় এবং মানুষ তাঁর নাটকের প্রধান বক্তব্য বিষয়। বিষয়ের প্রয়োজনেই নাট্য চরিত্রে তৈরি হয়েছে সংশয়-সংঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার। 'অঙ্গার' (১৯৫৯), 'রাতের অতিথি' (১৯৬৩),

‘ফেরারি ফৌজ’ (১৯৬৪), ‘ব্যারিকেড’ (১৯৭২), ‘টিনের তলোয়ার’ (১৯৭৩) নাট্যকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক।

বুদ্ধদেব বসুর সময়ে আরো অনেক নাট্যকার নাটক লিখেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন— সলীল সেনের ‘নতুন ইহুদী’ (১৯৫৩); কিরণ মৈত্রের ‘বারো ঘণ্টা’ (১৯৫৮); ধনঞ্জয় বৈরাগীর ‘এক পেয়ালা কফি’ (১৯৬০); ঋত্বিক ঘটকের ‘দলিল’ (১৯৫২); বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ (১৯৬৫); মনোজ মিত্রের ‘চাক ভাঙা মধু’ (১৯৭১), ‘নরক গুলজার’ (১৯৭৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়— বুদ্ধদেব বসুর নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্য ও শ্রেণিবিন্যাস। সৎ লেখকের সমস্ত জীবনই এক অন্বেষণ। এক অভিজ্ঞতা-অনুভবের পর অন্য এক অভিজ্ঞতা-অনুভবের নিরীক্ষণ। বুদ্ধদেব বসুর প্রভূত অধীত বিদ্যাই তাঁর নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে তাঁর নাট্যচর্চায় এসেছে বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য। বুদ্ধদেবের নাটক মানেই তো ‘কাব্যনাটক’ নয়, এই কথাটাই অনেকদিন পর্যন্ত অনেকেই বোধহয় জানতেন না। ‘মহাভারত’ নির্ভর কাব্যনাটকের পাশাপাশি তিনি অন্য ভাবনার অন্য স্বাদের একাঙ্ক নাটক, গদ্যনাটক, ছোটোদের জন্য নাটক লিখেছেন। তাঁর নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত একাঙ্ক ‘একটি মেয়ের জন্য’, ‘হিতাকাঙ্ক্ষী’ দিয়ে। প্রতিকূল তিরিশের দশকেও নাটক লিখেছেন তিনি। এই সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর নূতন আঙ্গিকে লেখা ‘নাট্যোপন্যাস’, ‘অনেকরকম’।

নাটক লেখায় প্রত্যাবর্তন করলেন বুদ্ধদেব বসু। হৃদয়-মন জুড়ে তাঁর ‘মহাভারত’। ‘মহাভারত’ কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানব-জীবনের মধ্যে প্রবহমান। এই কথাটা অবশ্য ভারতীয়দের অজানা নয়, নতুন করে বলারও প্রয়োজন আছে (‘মহাভারতের কথা’ মুখবন্ধ)। বুদ্ধদেব বসুর কবি ও নাট্যকার সত্তার অভিনব মিলনে সৃষ্টি হল অনবদ্য সব ‘কাব্যনাট্য’। পুরাণের আধুনিকীকরণ নয় সেগুলি, বলা যেতে পারে ‘পুরাণের নবজন্ম’। ‘রাবণ’— ‘সীতার প্রতি অসহায়ভাবে অনুরক্ত এক সাধারণ মানুষ, রাক্ষস নয়’। উপজীব্য বিষয় প্রেম ও কাম। যা তাঁর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকেরও মূল ভাববস্তু। কিন্তু ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ ভাব-পরিধি ছাড়িয়ে অন্য এক মুক্তির সন্ধান দেয়, যা পাশ্চাত্য মর্ডানিস্ট সাহিত্যের রিক্ততার আবাহন করে। রাবণ-ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর সংকট তাই ব্যক্তিক।

'কালসন্ধ্যা' ও 'সংক্রান্তি' নাটকে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির সংকটই মুখ্য। যদুবংশের ধ্বংস, কৃষ্ণের মতো একজন 'অপ্রহার্য অঘাতনীয় পুরুষ'কেও মেনে নিতে হয়েছিল 'দেহ ধারণের সব দৌর্বল্য রক্তমাংসের সব বিষাদ ও সহায়হীনতা যাতে আমরা তাঁকে সর্বক্ষণ পরমেশ্বর আখ্যা দিয়ে চিন্তাহীন ভানে অর্চনা না করি, যাতে ভুলে না যাই আমাদের সব দৈন্যেরও তিনি অংশীদার ('মহাভারতের কথা', বৃদ্ধ কাণ্ডারি, পৃ. ১৬৫-৬৬)। পূর্বে প্রকাশিত গৌরবের সংশোধক ও সম্পূরক রূপে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণকে। আজ কৃষ্ণেরও অভিপ্রেত অর্জুনের দারিদ্র্যিকরণ। আসলে অর্জুন কোনো উপহারই পায়নি, পেয়েছিলেন যথাসময়ে; উৎকৃষ্ট সব যুদ্ধ-উপকরণ ঋণস্বরূপ। এখন অর্জুনের উচিত এবং যথোচিত সেই সবের বিসর্জন। 'কালসন্ধ্যা' নাটকের 'উত্তরকথন'— অংশে ব্যাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এমনই এক সত্যবাণী।

বহুপরিচিত কথা, যার নেই কোনো পোশাকি আবরণ, দেখানোর মতো দার্শনিকতা। শব্দ আর দৃশ্য মিলেমিশে এ যেন চেকভের নাট্যরীতি থেকে হ্যারল্ড পিন্টারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কথোপকথনের জগতে প্রবেশ। ক্ষণিকের নীরবতা, আরো বেশি অর্থময় হয়ে উঠেছে। 'পাতা ঝ'রে যায়'— শব্দগুচ্ছ সময়ের প্রবহমানতা, বার্ধক্যের অতীতকারতা, অসহায়তা, আসক্তিহীনতা— জীবনের এই সত্য উপলব্ধিকে মূর্ত করে তুলেছে।

স্বাভাবিক সমাজ থেকে ব্রাত্য দুই মানব মানবীর এক যন্ত্রণাময় জীবন-আলেখ্য 'বাবু ও বিবি' নাটক। এই খর্বকায় দম্পতীর বাঁচার তাগিদ, সার্কাসের আঙিনায় তাঁদের প্রেম-অপ্রেম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভোগ-দুর্ভোগের জালে আটকে পড়া পরিণতিতে অসাধারণ নাটকীয়তা তৈরি হয়েছে। কাব্যনাটকের মতো এইধরনের নাটক বর্তমান দর্শক-পাঠক প্রজন্মকে সমানভাবেই আকর্ষণ করতে সক্ষম। তার জন্য প্রয়োজন নেই 'পুরাণকথা' জানার। বুদ্ধদেব বসুর নাটক তো শুধু নাটক নয়, তা যেন শর্ট-ফিল্ম, এমনই সিনেম্যাটিক তাঁর নাট্য-পরিবেশ ও সংলাপ। যা মুহূর্তের জন্য ঘাড় ফেরাতে দেয় না। যেকোনো নাটকের সফলতা হয়তো এখানেই।

বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মেজাজ ও আঙ্গিকে লেখা নাটকগুলির তালিকা তাদের শ্রেণি অনুসারে দেওয়া হল—

১. একাঙ্ক নাটক : 'হিতাকাঙ্ক্ষী' (তারিখ জানা যায়নি), 'একটি মেয়ের জন্য' (১৯২৯), 'লোকটা' (১৯৩৫), 'পাতা ঝরে যায়' (১৯৬৬), 'বাবু ও বিবি' (১৯৬৬), 'সত্যসন্ধ' (১৯৬৭), 'চরম চিকিৎসা' (১৯৬৮), 'কুড়ি বছর আগে অথবা পরে'

(১৯৭০), 'পঁচিশ বছর পরে অথবা আগে' (১৯৭১), অনুবাদমূলক নাটক— 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯৭০), 'ইক্ষাকু সেন্নিন' (১৯৭১)।

২. পূর্ণাঙ্গ গদ্যনাটক : 'অনেক রকম' (১৯৩৩), 'কাঠঠোকরা' (১৯৪২), 'মায়া-মালঞ্চ' (১৯৪৩-৪৪), 'কলকাতার ইলেক্ট্রা ' (১৯৬৭), 'পুনর্মিলন' (১৯৬৯), 'নেপথ্য নাটক' (১৯৭০)।

৩. ছোটোদের নাটক : 'বাড়ি চাই, বাড়ি' (সঠিক কোনো তারিখ জানা যায়নি), 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' (১৩২৯), 'জন্মদিনের উপহার' (১৯৩৩-৩৪), 'ধারে বিক্রি নেই' (১৯৪০), 'ওভার কোট' (১৯৪০), 'বড়বাবুর ব্যামো' (১৯৪৩)।

৪. কাব্যনাটক : 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৬৬), 'কালসন্ধ্যা' (১৯৬৭), 'প্রথম পার্থ' (১৯৬৯), 'সংক্রান্তি' (১৯৭০), 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০)।

৫. অন্যান্য নাটক : 'রাবণ' (১৯৩০), 'রুণু ও লোটুর প্রেম' (১৯৩৩), 'অনুরাধা' (১৯৩৬), 'দালিয়া' (১৯৫৪)।

তৃতীয় অধ্যায়— বুদ্ধদেব বসুর একাঙ্ক নাটক। জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশকে এক অখণ্ড রূপ দেওয়াতেই 'একাঙ্ক' নাটকের সার্থকতা। দ্রুতগতিতে নাটকীয় কৌতূহল তৈরি করে পরিণতির সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে তোলাই একাঙ্ক নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টার আধুনিক-মননের প্রকাশ 'একাঙ্ক' (একাঙ্কিকা)। বুদ্ধদেব বসুর 'একাঙ্ক' নাটকের অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবো, সে বিষয়গুলি হল—

ক. পূর্ববর্তী একাঙ্ক নাটক ও নাট্যকারগণ
খ. বুদ্ধদেব বসুর একাঙ্ক নাটকের নিবিড় আলোচনা
গ. সমসাময়িক একাঙ্ক নাটক ও নাট্যকারগণ
ঘ. বুদ্ধদেব বসুর একাঙ্ক নাটকের বিশিষ্টতা

বুদ্ধদেব বসুর আগে কে বা কারা একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন বলা কঠিন। একাঙ্ক নাটকের সার্থক প্রণেতা এবং একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য প্রথম যাঁর নাটকে ধরা পড়েছে তিনি হলেন মন্মথ রায়। মন্মথ রায়ের পূর্বে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো কোনো নাটক একাঙ্ক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হলেও, তাঁরা কেউই সচেতনভাবে 'একাঙ্ক' নাটক লেখেননি। বুদ্ধদেব বসুর পূর্ববর্তী সার্থক একাঙ্ক নাটক

রচয়িতা হলেন মন্মথ রায়। তাঁর 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক একাঙ্ক।

বুদ্ধদেব বসুর নাট্যকার জীবনের আরম্ভ, একাঙ্ক নাটক লিখে। 'আমার যৌবন'-২৮ শীর্ষক আত্মস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন— "পুরানা পল্টনে আমার একটি সদ্যযৌবনা প্রতিবেশিনীকে আমি মনে মনে ভালবেসেছিলাম।... সেই মাত্রা স্পর্শহীন প্রণয়ের বেদনা প্রকাশ করেছিলাম কঙ্কাবতীর দু-একটি কবিতায় এবং একটি ইচ্ছাপূরণকারী একাঙ্ক নাটকে, যার শিরোনামা ছিল 'একটি মেয়ের জন্য'..." ('আমার যৌবন', পৃ. ৬২)। এখনো পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর লেখা যতো নাটক পাওয়া গেছে, 'একটি মেয়ের জন্য' তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক বলেই বিবেচিত হয়। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নবশক্তি' পত্রিকায় (১৩৩৬) তাঁর ছাত্রাবস্থায়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এই নাটকটি জগন্নাথ হলে অভিনীত হয়েছিল।

বিশুদ্ধ প্রেম যেকোনো প্রকারের প্রতিবন্ধকতা, বিরোধিতা, সংকীর্ণতাকে দূর করতে সক্ষম। এই নাটকে অপূর্ব ও সন্ধ্যা চরিত্রের মধ্যে সেটাই দেখতে পাই। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে 'চুম্বন দৃশ্য'-এর সংঘটনে বুদ্ধদেব সাহস দেখিয়েছেন। নাটকটির বিষয়ে তিনি লিখেছেন— "...অধ্যাপক রমেশ মজুমদার আমার লেখাটাকে অনুমোদন করলেন জগন্নাথ হলে অভিনয়ের জন্য, শুধুমাত্র চুদনের দৃশ্য বর্জন করে। উপস্থাপনা বোধহয় ভালোই হয়েছিল, ...লোকেরা নিন্দে করেনি, মাঝে-মাঝে প্রেক্ষাগৃহ থেকে হাসির শব্দও শোনা গিয়েছিল।" ('আমার যৌবন', ২৮ শীর্ষক আত্মস্মৃতি, পৃ. ৬২-৬৩)। নাট্যকার জীবনের শুরুতেই, প্রথম নাটকের অভিনয় সাফল্য লাভ, একজন নাট্যকারের বড়ো প্রাপ্তি।

কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের 'Purgatory' নাটকের অনুলিখন বুদ্ধদের বসু **'প্রায়শ্চিত্ত'** নাটকটি। ইয়েটসের 'Purgatory'-র পটভূমি পাল্টে, ভারতবর্ষের বাদশাহি আমল ও সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিতে নির্মিত হল বুদ্ধদেব বসুর 'প্রায়শ্চিত্ত'। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— "নাটকটির বহিরঙ্গ আইরিশ ও শিরোনামা খৃষ্টান হলেও এর ভিতরকার কথাটি হিন্দুভাবাপন্ন।" 'Purgatory' কাব্যনাটকের শুধুমাত্র ভাবার্থটুকু গ্রহণ করলেন বুদ্ধদেব। বাংলা ভাষায় প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াস 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। 'অনুলিখন'-ও কতো উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম হতে পারে বুদ্ধদেবের 'প্রায়শ্চিত্ত' তা প্রমাণ করে।

জাপানী লেখক কোম্পার মোতায়াসুর নো-নাটকের অনুলিখন **'ইক্কাকু সেন্নিন'**। "শব্দ বা পঙক্তির নিবিষ্ট অনুসরণ নয়, নাটিকাটির সামগ্রিক পরিকল্পনা ও গঠনশিল্পকে

বাংলা ভাষায় মূর্ত করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যেমন ছিল পার্গেটরির অনুলিখনেও।" প্রথম থেকে বুদ্ধদেব মনোমত একটি অনুলিখনে প্রস্তুত, তা জানিয়ে দিলেন। 'ইক্কাকু সেন্নিন'-এর অনুলিখনে সহায়ক পুথিগুলির নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল— (১) 'রোমান হরফে মূল জাপানি'; (২) 'একটি পঙক্তি নিষ্ঠ আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ'; (৩) 'সেই আক্ষরিক অনুবাদের একটি কাব্যিক পুনর্লিখন'।

'ইক্কাকু' পুরোপুরি ঋষ্যশৃঙ্গ নয়। আবার ঋষ্যশৃঙ্গ বললেও ভুল বলা হয় না। 'ঋষ্য' শব্দের অর্থ 'হরিণ'। অর্থাৎ হরিণের মতো শিং যার, তিনিই ঋষ্যশৃঙ্গ। "কালো চুল কপাল জুড়ে লুটোচ্ছে, আর মধ্যিখানে শৃঙ্গ, তাঁর একটি মাত্র শৃঙ্গ" ('ইক্কাকু সেন্নিন', পৃ. ১০৮)। মার্কিনী কবি 'ইক্কাকু' নামের পরিবর্তে বার বার 'য়ুনিকর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'ধুনিকর্ণ'-এর আক্ষরিক অর্থ 'একশৃঙ্গ' [লাতিন— Uni (এক) + Cornu (শৃঙ্গ)]।

ঋষ্যশৃঙ্গ জাপানের মাটিতে পা দিয়ে, হয়তো তাঁর কৈশোর, সরলতা এবং কৌমার্য হারিয়েছিলেন। তাঁর বয়সের কোনো উল্লেখ নেই। কথার মধ্যেই ধরা পড়ে তিনি কিশোর ব্রহ্মচারী নন, সংসার-নারী বিষয়েও অভিজ্ঞ। সুরা তাঁর কাছে অচেনা বস্তু নয়। "এই মেয়ে যুবতী। সুন্দরী।... কোনো রাজপুরীর রত্ন।... সাধারণ মানবী নয়" (পৃ. ১১৩)। বিস্ময়ের সঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন— "হিমদেশবাসী কিমোনো পরিহিত সাকেপায়ী কবিরা, তাঁদের শিন্তো ও zen প্রসূত মানসিকতা নিয়ে, হিন্দু রসবস্তুকে কেমন চমকপ্রদ নতুনরূপে সাজিয়ে ছিলেন। কিন্তু শুধু রূপান্তর নয় এটাকে জন্মান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না।" ঋষ্যশৃঙ্গের মতো ইক্কাকুও অজ্ঞাত ছিল নিজের বিষয়ে। সে বলেছে "আশ্চর্য। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মদের আর নারীর নেশায় ভরপুর। আশ্চর্য— আমিও তবে মানুষ" (পৃ. ১১৩)। দুই দৈত্য বালকের কণ্ঠে সে কথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম দৈত্য বলেছে— "ইকাকু, একশৃঙ্গ, তপস্বী জাদুকর—/কিন্তু আর নও আদুকর, নও তপস্বী।" (পৃ. ১১৩)। দ্বিতীয় দৈত্য বলেছে— "জাদুকরকে জাদু করেছে নারী,/বিজয়ীকে জয় করেছে মদিরা" (পৃ. ১১৩)। হতবুদ্ধি ইকাকুর কণ্ঠেও শোনা যায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি— "ইক্কাকু, একশৃঙ্গ কী করবে তুমি এখন?"

চতুর্থ অধ্যায়— বুদ্ধদেব বসুর পূর্ণাঙ্গ গদ্য নাটক। প্রতিদিনকার রুক্ষ-রূঢ়, মলিন, দীন-হীন যাপিত জীবনের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলাই গদ্যনাট্যকারের ইঙ্গিত। লক্ষ প্রত্যক্ষ বাস্তব। সেখানে অন্তর্গূঢ় আবেগের প্রকাশ বাহুল্যমাত্র। ভাষাতীতকে সেখানে পাওয়া

যায় না। বুদ্ধদেব বসুর 'পূর্ণাঙ্গ গদ্যনাটক'-এর অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবো, সে বিষয়গুলি হল—

ক. পূর্ববর্তী গদ্যনাটক ও নাট্যকারগণ

খ. বুদ্ধদেব বসুর গদ্যনাটক

গ. বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক গদ্যনাটক ও নাট্যকারগণ

ঘ. বুদ্ধদেব বসুর গদ্যনাটকের স্বতন্ত্রতা

বিষয় বিন্যাসের মৌলিকতায় এবং বিভিন্ন প্রকার নাটকীয় চরিত্র চিত্রণের বাস্তবায়নে বুদ্ধদেব বসুর গদ্য নাটকগুলি আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর 'অনেকরকম' নাট্যোপন্যাস, পরবর্তী সময়ে 'ক্ষণিকের বন্ধু' উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়। 'মায়া-মালঞ্চ' বুদ্ধদেবের 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ। 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' গ্রীক পুরাণের অতিপরিচিত চরিত্র আগামেননের কন্যা ইলেক্ট্রা। তাঁকে বুদ্ধদেব 'সমকালীন বাংলাদেশের পটভূমিকায়'— নূতন নামে, নূতন রূপে গড়ে তুলেছেন। গ্রীকপুরাণের ইলেক্ট্রা মাতৃহত্যার দায়ে সরাসরি অভিযুক্ত নয়, হত্যাকারী অরিস্টিস। মাতৃহত্যার পুরো দায়ই শম্পার, অদ্রি নিমিত্তমাত্র। শম্পার অচিকিৎস্য অন্তর্দাহ, প্রতিশোধস্পৃহার ফলশ্রুতি— মাতৃহত্যার বিষাদময় পরিণতি।

'পুনর্মিলন' নাটকের পটভূমি এক ফেরিঘাট। মদনপালের ভাষায় বললে— 'মড়াপোড়া'। জয়া, নীলকণ্ঠ, মদনপাল ও শিবু অপেক্ষা করছে 'চৌমুহনী ফেরিঘাটায়'। তারা যাবে নবীনগঞ্জে। ক্ষমা-প্রেম-করুণা নবীনগঞ্জে যাওয়ার পাসপোর্ট। এদের কারো মধ্যেই নেই, সেইসব গুণগুলি। একমাত্র ব্যতিক্রম অরুণা। তাই জয়া-নীলকণ্ঠ-মদন-শিবুর প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে।

পাঁচ মৃত ব্যক্তি, একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মৃত্যুর পরেও জীবিতকালের অভিজ্ঞতা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। মৃত্যুর পরেও জীবিতকালের পুনরাবৃত্তি, তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা আজ জীবিত না মৃত? না জীবন্মৃত? এ সংশয় থেকেই গেছে। 'পুনর্মিলন'-এর পরতে পরতে সেই সব জীবিত মৃত আত্মার আত্তিই শোনা যায়। নীলকণ্ঠ বিস্ময়ে হতাশায় উচ্চারণ করে বারবার "আমি কি সত্যি? না কোনো বানানো গল্প? ...এমনও তো হতে পারে আমরা মরে গিয়েছি, কিন্তু জানি না? এমনও তো হতে পারে আমরা বরাবর মরে ছিলাম। কিন্তু জানতাম না? ...আমি জেগে উঠতে চাই— এই

স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে চাই। ...মৃত আমরা সবাই মৃত। ...এখনো! এখনো বুকের শব্দ। মরতে পারার মতো শেষ ক্ষমতাটুকু— তাও কি আমাদের নেই? ...ভগবান উদ্ধার করো।"

বিপরীত দিকে জয়া এই সংশয়-সংকটকে আরো জটিল করে তুলেছে। জয়া বলে— "...তুমি কষ্ট পাচ্ছ, নীলু। মরে গেলে কি আর কষ্ট থাকে? ...নীলু, আমি একবার ভেবেছিলাম আমি মরে গিয়েছি। তখন আমার কোনো কষ্ট ছিল না। কিন্তু এখন— এই কষ্ট— তাই কি প্রমাণ নয়? এই ইচ্ছে— তাই কি প্রমাণ নয়? ...আমার বুকে হাত রেখে দ্যাখো। কেমন শব্দ— টিপ টিপ টিপ টিপ— তোমার জন্য, নীলু, তোমার জন্য।" মদন পালের উক্তিতে নাট্যরস আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। মদন বলে— "(অট্টহাসি করে)। কী সব বলছে এরা! যেন 'এখন' বলে কিছু আছে। এখন, তখন, কখন— সব এক। সব এক!... নেই— শেষ নেই— শেষ নেই।" এমনই এক হিমশীতল পরিবেশে, বিষাদময় পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি।

পঞ্চম অধ্যায়—বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের নাটক। সচেতন ও প্রস্তুত লেখক বুদ্ধদেব বসু ছোটোদের জন্য লেখাগুলি একটা অন্যমাত্রা পেয়েছিল তাঁর রচনাগুণে। তাঁর রচনার বিষয় পাঠককে জীবনে ও সাহিত্যে দীক্ষিত করে, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে চারিপাশকে, শনাক্ত করতে চায়, নাগাল পেতে চায় অন্য এক গভীরতার। তাঁর লেখা— "...বিশেষ অর্থে শিশুপাঠ্য থেকেও...বড়ো অর্থে সাহিত্য, শিল্পকর্ম।" ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে তিনি লিখলেন সকলের জন্য নাটক। সাবালক পাঠক-দর্শককেও দিতে চাইলেন তার আস্বাদন। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর নাটকগুলি এক কথায় অতুলনীয়। বুদ্ধদেব বসুর 'ছোটোদের নাটক'-এর অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবো, সে বিষয়গুলি হল—

ক. বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের জন্য লেখা নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

খ. ছোটোদের জন্য লেখা নাটকগুলির অভিনবত্ব

জনস্টোন কোম্পানির বড়বাবু শ্যামাকান্ত লাহিড়ী ভবানীপুরের বাড়িতে বসবার ঘরে তিনি শুয়ে আছেন ইজিচেয়ারে। অফিসের সহকর্মীরা তাঁকে দেখতে এসেছেন একে একে। তাঁদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কীভাবে প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠা বড়বাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন তারই নাটকীয় উপাখ্যান **'বড়বাবুর ব্যামো'** নাটকটি। কানাইবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাকান্ত জানিয়েছেন— 'ঠিক স্ট্রোক আমার হয়নি'। ডাক্তার বলেছেন ব্লাড প্রেসারটা বেশি। তবে ঠিকমতো খাবার খেলে এবং বিশ্রাম নিলে সেরে উঠবো তাড়াতাড়ি। বিভিন্ন

চরিত্রের মুখে শুনে নেওয়া যাক, 'বড়বাবুর ব্যামো' উপলক্ষে তৈরি হওয়া নাটকীয়তা, ঠিক কী?

শ্যামাকান্ত	—	এই নাইতে যাবার সময় বাথরুমে...পড়ে গিয়েছিলুম।
রমেন	—	...পড়ে অজ্ঞান হলেন, না অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন?
রতিকান্ত	—	বলেন কী, স্যর। তবে তো খুব সিরিয়াস কেস!
কানাই	—	...ব্লাড প্রেসারও যা, যম রাজার প্রথম পরোয়ানাও তাই।
শ্যামাকান্ত	—	অ্যাঁ— কী বললেন, কানাইবাবু?
হরেন	—	...ওর কথায় কান দেবেন না, স্যর, হোমিওপ্যাথি মতে এক বছরেই আপনাকে সারিয়ে দেওয়া যাবে।
শ্যামাকান্ত	—	এ-ক-ব-ছ-র!
কানাই	—	ভয় হয়, ...একেবারে ভবযন্ত্রণা থেকেই উনি মুক্তি না পান।
শ্যামাকান্ত	—	(ভাঙা ভাঙা গলায়)। কী বললেন, কানাইবাবু।
হরেন	—	...ওঁর মুখ কী রকম নীল হয়ে গেছে, চোখ কপালে উঠেছে, ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে— এসব লক্ষণ তো ভালো নয়।
শ্যামাকান্ত	—	অ্যাঁ? কী বললেন? তবে কী সত্যিই— ওরে কমল, তোর মাকে ডাক, ...আমি বুঝি আর বাঁচি না।...

ষষ্ঠ অধ্যায়— বুদ্ধদেব বসুর কাব্য নাটক। কাব্য নাটক এক কথায় 'অন্তনাটক'। চলমান জীবনের ভিতরে যে নাটক, তাকেই তুলে ধরে কাব্যনাটক। কবিত্ব নয়, জীবনের গহন-অনুভূতি ব্যক্ত করাই কাব্যনাটকের লক্ষ। কাব্য নাটক গদ্য বা পদ্য যে ভাষাতেই লেখা হোক, তার মূল লক্ষ 'ব্যঞ্জনা'। যে ব্যঞ্জনাতে প্রত্যহের ধূলিও হয়ে উঠবে স্বপ্নরঙিন, প্রত্যক্ষ বাস্তব হবে ধ্যানময়তায় লীন। কাব্যনাটককে কবিতা হলেই চলে না, হতে হবে অভিনয়যোগ্য। 'পূর্ণাঙ্গ নাটক' বলতে যা বোঝায়, 'কাব্যনাট্য' তা নয়। সমগ্রজীবন নয়, জীবন-সমগ্রকেই তুলে ধরে 'কাব্যনাটক'। বুদ্ধদেব বসুর 'কাব্য নাটক'-এর অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবো, সে বিষয়গুলি হল—

ক. বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

খ. সমসাময়িক কাব্যনাট্যকারগণ

গ. কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আলোচনা

ঘ. পুরাণ নির্ভরতা

ঙ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব

চ. টি.এস এলিয়টের প্রভাব

ছ. বোদলেয়ারের প্রভাব

জ. পুরাণের নবভাষ্য

বুদ্ধদেব বসু জীবনের শেষ দশটা বছর গভীরভাবে নিমজ্জিত ছিলেন 'মহাভারত', 'রামায়ণ' পাঠে। 'মহাভারতের কথা'-গ্রন্থে তিনি লিখেছেন— "...একমাত্র মহাভারতেই— ভারতভূমিতে উদ্ভূত সবগুলি চিন্তাধারার পদচিহ্ন প্রতীয়মান, এবং এটি কোনো গোষ্ঠীগত গুহাবদ্ধ ধর্মপুস্তক নয়।" তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নাটকগুলির উৎসভূমি 'মহাভারত' পুরাণ।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাটকের উৎস 'মহাভারত-রামায়ণ'। নাটকটির ভূমিকা অংশে বুদ্ধদেব লিখেছেন— "...একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি; তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা।" আধুনিক মানুষের স্বল্প-বেদনার প্রতিরূপ— ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী; বুদ্ধদেব বসুর অসাধারণ রচনাগুণে পুরাকালের হয়েও মানসিকতায় সমকালীন হয়ে উঠেছে।

সমকাল ও শাশ্বতকালের সঙ্গে মহাভারতীয় পুরাণ কাহিনির (মুষল পর্ব) সংঘটনে রচিত বুদ্ধদেব বসুর **'কালসন্ধ্যা'** কাব্যনাটক। জীবন প্রবহমান জাতক নয়, স্থায়ী গৌরব জীবনের, ব্যক্তির নয়। মহত্তম প্রতিভাও কালদণ্ডে দণ্ডনীয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে জন্ম নেওয়া ধ্বংস-বীজ ছত্রিশ বছর পর দ্বারকার মতো সমৃদ্ধশালী সভ্যতার বিনাশ ঘটিয়েছে, সেই সঙ্গে নাশ করেছে মানবিক শুভবুদ্ধির। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— "যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,/যা নেই, তা কখনো ছিল না।" পুরাণ কাহিনির রূপকে বর্তমান মানবজীবন-সভ্যতার শাশ্বতবাণী উচ্চারিত হয়েছে ব্যাসদেবের কণ্ঠে— "তবু সৃষ্টি যেহেতু সীমাবদ্ধ, এবং স্রষ্টাও/স্বরচিত নিয়মের বশবর্তী,/তাই তিনি বিনা প্রতিবাদে/সব হতে দিয়েছেন যথাকালে, যথোচিত ভাবে।/কিন্তু আর প্রয়োজন নেই— আপাতত তাঁর, বা তোমার। অর্জুন, ...জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হল, অন্য এক বৃত্ত এরপরে হয়তো বা আরব্ধ এখনই। যাত্রা করো, বিদায়।"

মহাভারতের ট্র্যাজিক-নায়ক কর্ণ। বুদ্ধদেব বসুর **'প্রথম পার্থ'**-এ নবরূপে উপস্থিত। সর্বমানবকে সে ভাই বলে সম্বোধন করেছে। মানবিকতাই তাঁর ধর্ম। বিনা চেষ্টায়, জন্মসূত্রে পাওয়া কোনোকিছুকেই সে গ্রহণ করবে না। কর্ণ বোঝো যুদ্ধ অন্যায়, সব হত্যাই ভ্রাতহত্যা। তবে সে যুদ্ধ চায়। কারণ এ যুদ্ধ তাঁকে দেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই সে অপেক্ষমাণ

সেই মহান নিষ্করুণ পরীক্ষার জন্য, যার মধ্য দিয়ে অবশেষে— কর্ণ পাবে আত্মপরিচয়, নিজের কাছে হতে পারবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত। অস্তিত্বের সংকটে পীড়িত, নিঃসঙ্গ, মাতা কুন্তীর স্নেহ লালায়িত, দ্রৌপদীর প্রেম বঞ্চিত কর্ণ স্বীকার করে নেয় ভবিতব্যকে। এই ভাবে 'প্রথম পার্থ' হয়ে ওঠে আধুনিক মানবের প্রতিরূপক।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের ঘটনাকাল নিয়ে রচিত বুদ্ধদেব বসুর **'সংক্রান্তি'**। 'মহাভারত' এবং 'সংক্রান্তি'র সময়ের ব্যবধান অনেক। দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনেও পাল্টায়নি— যুদ্ধক্ষেত্রে কোনোকালেই, কোনো নীতিধর্ম কার্যকর ছিল না, আজও নেই— এ সত্যটুকু। বর্তমান সভ্যতা এক ভয়ংকর পরিণতির মুখে দাঁড়িয়ে। যুদ্ধে কোনো ন্যায়ধর্ম নেই, তাই প্রতিটি হত্যা ভ্রাতৃহত্যা। প্রভেদ নেই, দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠিরের মধ্যে। চিরসত্য— মহাকাল, যা যুগে যুগে হরণ করে মানবিক শুভবুদ্ধিকে শোণিতে জাগায় উন্মাদনা সূচিত করে ক্রান্তিকালের। এমন করেই লুপ্ত হয়ে যায় এক একটি মহৎ বংশ।

'মহাভারত'-এর বিদুর – জন্মবৃত্তান্ত **'অনামী অঙ্গনা'** নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়। তিনি নামপরিচয়হীন বিদুর মাতা অঙ্গনাকে, শাশ্বত প্রেম ও মাতৃত্বের গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন। "...তাকে জন্ম দিতে চাই, লালন করতে চাই/এই রাজপুরীতে, হস্তিনাপুরে।/ব্যাসের পুত্র সে অন্য কারো নামে পরিচিত হবে, লালিত হবে অন্য কোনো সংসর্গে আমার পক্ষে এই চিন্তা অসহ্য।" পুত্রের আত্মপরিচয় দানে সক্রিয়-সচেতন, অথচ নেপথ্যচারী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল আধুনিক মানসী অঙ্গনা।

সপ্তম অধ্যায়— বুদ্ধদেব বসুর নাটকে পুরাণকথার ব্যবহার। মিথকথা বা পুরাণকথার ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অধ্যায়ে তাঁর বিভিন্ন নাটকে কীভাবে এই মিথকথার ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখানো হবে।

অষ্টম অধ্যায়— বুদ্ধদেব বসুর নাটকের চরিত্র চিত্রণ। নাটক বর্ণনাত্মক নয়, ক্রিয়াত্মক। 'Action'-এর মধ্য দিয়ে চরিত্রের (Character) সৃষ্টি হয়। নাটকের চরিত্র দু'রকমের হয়। (এক) শ্রেণি বা টাইপ চরিত্র; (দুই) বিকাশশীল চরিত্র। টাইপ চরিত্রগুলি সময়ের পরিবর্তনেও অপরিবর্তিত থেকে যায়। বিকাশশীল চরিত্রগুলি ঘটনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হতে থাকে। এই ক্রমবিবর্তনশীল চরিত্রগুলিই নাটককে সপ্রাণ করে তোলে।

প্রধানত কোনো ঘটনার ভাবকে প্রাণবন্ত করে তুলতেই প্রয়োজন হয় একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্বের। নাট্যকারের উদ্দেশ্য চরিত্রের রহস্য উন্মোচন করা নয়, মূল উদ্দেশ্য জীবনের সুখ-দুঃখের পরিণাম দেখিয়ে নাট্যরস পরিবেশন করা। ব্যক্তির আচরণই তার সুখ-দুঃখের পরিণাম সূচিত করে। তাই কোনো চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রহস্য অপেক্ষা আচরণ বা ঘটনার ক্রম-পরিণতির প্রতিই নাট্যকারকে বেশি সচেতন হতে দেখা যায়। —ঘটনা ব্যক্তি জীবনেরই ঘটনা এবং ঘটনার উৎস ব্যক্তি স্বভাব (চরিত্র)। সুতরাং চরিত্র নিরপেক্ষ হয়ে কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে না। কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা বসাতে হবে সে পরিকল্পনা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত চরিত্রের রহস্য ব্যক্ত করাও সম্ভব হয় না। ঘটনা ছাড়া নাটক হয় না, কিন্তু চরিত্র ব্যতীত নাটক হতে পারে— এই আপ্তবচন আলোচনা সাপেক্ষ। তবে ঘটনা এবং চরিত্র যে, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক তা বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে।

'রাবণ' নাটকটি নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর মনে প্রথম বাসনা হয়েছিল নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা পাবার। সে ইচ্ছার কথা তিনি তাঁর 'আমার যৌবন' আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন। রাবণ চরিত্র অংকনে অনেকগুলি 'Shade'-এর ব্যবহার করেছেন বুদ্ধদেব। ভাই বিভীষণের সঙ্গে আলাপচরিতায় রাবণ নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষ। ভাইকে প্রাণ খুলে হাসতে পরামর্শ দিয়েছেন। সেই রাবণই মন্দোদরীর কথা প্রসঙ্গে বলেছেন— সীতা পরস্ত্রী! "...কে ওর স্বামী? ঈশ্বরের চোখে বিবাহ নেই, ...আছে বাসনা আর মিলন।" নারীমনের চিরন্তন ঈর্ষা বিষয়েও তিনি সচেতন। মন্দোদরী আমার স্ত্রী, "...তিনি প্রতিবাদ না করলেই বরং আমার আত্মশ্লাঘা আহত হতো।" 'সীতাহরণ' অন্যায় তিনি তা মেনে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি চান সীতাকে একটা সুযোগ দিতে— তাঁকে ভালোবাসার। রূপে নয়, ঐশ্বর্যে নয়, সীতাকে তিনি জয় করতে চান প্রেম দিয়ে। অন্তঃপুরের সহস্রদেব-কন্যার সকলেই সাদরে, স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেছেন নিজেদের রাবণের কাছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন রাবণও ভালোবাসতে পারেন। তাই সীতার কাছে রাবণের আত্মসমর্পণের স্বীকারোক্তি— "আমি ক্লান্ত, ক্লান্ত...রক্ষোরাজ, বীরশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রের আতঙ্ক, কুবেরের ঈর্ষা— সব আমি হয়েছি। আশা করবার, জয় করবার, সব আমি হয়েছি, সব আমি পেয়েছি, এখন আমি ক্লান্ত, আমি একা। ...কেউ নেই যার কাছে...মনের কথা বলতে পারি।" এতদিন বিশ্বাস করতাম ভালোবাসলেই, ভালোবাসা পাওয়া যায়। কিন্তু না সে ধারণাও আজ আমার ভেঙে গেছে। প্রতিদানের আশা নেই জেনেও ভালোবেসে যেতে হয়। "...শুধু তোমার কাছেই, সীতা, আমি রাজা নই, আমি রাবণ।" এই দীর্ঘ জীবনে রাবণ শুধু সীতাকেই ভালোবেসেছে,

হয়তো ভালোবাসতে পারতো। কিন্তু দূর আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রান্তে রাবণ তার সুযোগ হারিয়েছে, সীতাও হারিয়েছে সুযোগ রাবণকে ভালোবাসার। রাবণ বলেছেন আত্ম-অহংকার নয় সীতা "তোমার ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা হয়তো রাবণের ছিল।" কার সাধ্য ত্রিভুবনে, কোনো বিমুখ হৃদয়কে ফেরায়। তাই নীরবে, শান্তভাবে রাবণকেও মেনে নিতে হয় এই পরাজয়। রাবণের কণ্ঠে সেই দীর্ঘশ্বাসই শুনতে পাই— কি আগুনই জ্বালালে সীতা, আমার হৃদয়ে, জীবনে এবং এই সোনার লঙ্কাপুরীতে। ভালো লাগছে না, জীবন এমন বৈচিত্র্যহীন, বিস্বাদ, নির্জীব হতে পারে রাবণ কল্পনাও করতে মনে আজ গভীর শান্তি, শত্রুতা-হিংসা-ঘৃণা— মৃত্যুর হাত সব মুছে দিয়েছে...।" রাম আজ এখানে থাকলে, তাকে জড়িয়ে ধরতেন রাবণ। —"হে মহাদেব...মৃত্যু দাও, ...মুক্তি দাও— এই দীর্ঘ, দীর্ঘ জীবনের ভারে আজ আমি ক্লান্ত।... এবার মৃত্যু, এবার মুক্তি।" এই মুক্তির দেবতার প্রতি সারণের কণ্ঠে শোনা যায় সশ্রদ্ধ অভিবাদন— "নির্মল তুমি, হে নির্মম,/মৃত্যুর রূপ, নমো হে নমো,/তোমার পূজায় জ্বলে'- জ্বলে' যায়।/জীবনের আবিলতা/হে বহ্নি-দেবতা।" এমনি করেই বুদ্ধদেব বসুর 'রাবণ'— পুরাকালের হয়েও মানসতা ও দ্বন্দ্ব-বেদনায় আধুনিক মানুষের প্রতিরূপক হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধদেব বসুর 'বুদ্ধদেব বসুর নাটকের চরিত্র চিত্রণ'-এর অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবো, সে বিষয়গুলি হল—

ক. বুদ্ধদেব বসুর নাটকের পুরুষ চরিত্র
খ. বুদ্ধদেব বসুর নাটকের নারী চরিত্র
গ. বুদ্ধদেব বসুর নাটকের পৌরাণিক পুরুষ চরিত্র
ঘ. বুদ্ধদেব বসুর নাটকের পৌরাণিক নারী চরিত্র
ঙ. বুদ্ধদেব বসুর নাটকের অন্যান্য চরিত্র

নবম অধ্যায়— বুদ্ধদেব বসুর নাটকের সংলাপ (ভাষা)। বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংলাপের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস বাংলা গদ্যের বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বাংলা পদ্যের ক্রম-পরিণতির সঙ্গে নাট্য-সংলাপও পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যেও সংলাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। নাটকের প্রাণ সংলাপ। কথোপকথনের মধ্য নাট্যসাহিত্যেও সংলাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। নাটকের প্রাণ সংলাপ। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্য চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সংলাপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটক কোন প্রকার, তার ওপর ভিত্তি করেই নাটকের সংলাপ রচিত

হয়। নাটকের চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে সেই নাটকের ভাষা। সংলাপ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেমনই হোক, অবশ্যই হবে তা নাটকীয় এবং নাট্যশ্লেষ সম্বন্ধিত। নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাটকের প্রতিটি চরিত্রকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয় সংলাপ। চরিত্রের মর্মগত সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্যঞ্জনাময় এবং ইঙ্গিতধর্মী সংলাপ ব্যবহৃত হয়। যা নাটকের পাত্রপাত্রীদের গভীরতা দান করে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে মধুসূদন, দীনবন্ধু থেকে শুরু করে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের হাতে নাটকের সংলাপ বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। বুদ্ধদেব বসু সেই ধারাতেই নতুন মাত্রা যোগ করলেন। তাঁর নাটকের অন্যতম আকর্ষণ 'ভাষা'। ভাষা ব্যবহারে সহজ সাবলীলতা তাঁর বহু শ্রমদ্বারা অর্জিত। বাংলাভাষাকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর করে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন— মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হোক; কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত হবে 'শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, মাত্রা ও ধ্বনিজ্ঞান'। ছন্দোমুক্তির অন্বেষণে বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন যে, চলিত ভাষাই স্বাভাবিক এবং এর কোনো বিকল্প নেই। গদ্যভাষা তাঁর কবি ব্যক্তিত্বেরই সম্প্রসারণ। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক সর্বত্রই তাঁর এই কবি সত্তার প্রকাশ। 'ভাষার সহজ বৈচিত্র্য' কবিদেরই দান। চলিত ভাষার আন্দোলনকে সার্থক করেছেন আধুনিক কবিরা, বুদ্ধদেব বসু অন্যতম। বুদ্ধদেব বসুর 'বুদ্ধদেব বসুর নাটকের সংলাপ'-এর অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবো, সে বিষয়গুলি হল—

ক. বুদ্ধদেব বসুর নাটকে গদ্য সংলাপের অভিনবত্ব

খ. বুদ্ধদেব বসুর নাটকে পদ্য সংলাপের প্রয়োগ মাধুর্য

সাহিত্যের স্বীকৃতি এবং সামাজিক স্বীকৃতি এক জিনিস নয়। সাহিত্য সব সময়েই সমাজ থেকে এগিয়ে থাকতে চায়, সেইভাবে তাকে তুলে ধরতেও চায়। প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্ক— এই দুই সীমারেখা সাহিত্যে, সমাজে আজও স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের পরে বুদ্ধদেব বসু এমনই একজন সাহিত্যিক, যিনি নিজের জীবনের প্রায় সবটাই বাংলা সাহিত্যকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, রুচিশীল এবং সৃষ্টিশীল করতে ব্যয় করেছেন। 'যা কিছু সময়োচিত তা-ই যথাযথ'। ('কালসন্ধ্যা', পৃ. ৯৩) এই 'যথাযথ'— হওয়াতেই বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিকর্ম সমকালীন হয়েও, চিরকালীন। এই অংশে নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর নাটকের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হবে।